ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 541-548
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.242

ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় বৌদ্ধ নৈতিক দর্শনের আলোকে এর তাৎপর্য ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

ড. সঞ্জয় পাল, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, রাইপুর ব্লক মহাবিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The four Brahmavihāras Maitrī, Karuṇā, Muditā, and Upekkhā constitute the core of Buddhist ethical and spiritual philosophy. Rooted in the Buddha's teachings of non-violence, empathy, and inner purification, these four sublime states guide human consciousness toward universal harmony and liberation. Maitrī promotes unconditional love and goodwill toward all beings, eliminating hatred and enmity. Karuṇā inspires the sincere desire to alleviate the suffering of others, thus fostering an active sense of empathy and social responsibility. Muditā encourages rejoicing in others' happiness, countering jealousy and rivalry, and nurturing a spirit of collective well-being. Finally, Upekkhā teaches balance and impartiality amidst life's dualities gain and loss, praise and blame, joy and sorrow thus ensuring inner stability and wisdom.

In a world increasingly marked by violence, selfishness, and mental unrest, the practice of Brahmavihāra offers a profound path to personal and social peace. These four virtues are not merely religious ideals but universal principles of human conduct that transcend time, culture, and creed. When internalized, they transform individual consciousness and establish compassion, cooperation, and equanimity as the foundations of social harmony. Therefore, the four Brahmavihāras embody both an ethical ideal and a practical guide for achieving universal peace, psychological balance, and the ultimate realization of human goodness.

Keywords: Brahmavihāra, Buddhist Ethics, Compassion, Universal Love, Inner Peace

বৌদ্ধ ধর্ম মানবজীবনের এক গভীর মানসিক ও নৈতিক দর্শন, যার উদ্দেশ্য হলো জীবের মুক্তি, শান্তি ও সর্বজনীন কল্যাণ। বুদ্ধ মানুষের অন্তরের অশান্তি, হিংসা, লোভ, মোহ ও অহংকার থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। এই মুক্তি কেবল আধ্যাত্মিক নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক শান্তিরও ভিত্তি। বুদ্ধ বলেছেন-

"নহি বেরোনি বেরাণি, সমন্তীধা কুদাচনং।
অবেরেণ চ সংমন্তি, এস ধম্মো সনন্তানো।" (মহাস্থবির, শ্লোক নং-৫, ২)

অর্থাৎ "শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতা নিঃশেষ হয় না; কেবল অশত্রুতা বা মৈত্রী দ্বারা তা নিঃশেষ হয়।" এটাই সনাতন ধর্ম। গুণী, সহিষ্ণু, শান্তিপূর্ণ, সুখময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার ভাবনা অসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারে। বৌদ্ধধর্ম দর্শন মানুষের মঙ্গল ও মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচারিত হয়েছিলো। বিশ্ব সভ্যতায় মানবতার প্রবক্তা বুদ্ধ এবং মানবতা সতত প্রকাশমান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে। বৌদ্ধ দর্শন যে সম্পূর্ণরূপে মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে মুক্তির পথ দেখিয়েছে তা চিরন্তন ও শাশ্বত। মানুষের অন্তর সত্তা বিকশিত হলেই মনুষ্যত্ব, মানবিকতাবোধ

জাগ্রত হয়। মানবিকতা বিকাশে ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের অনুপম প্রকাশ ব্রহ্মবিহার ভাবনার আবেদন অনবদ্য। আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, মানবিক গুণাবলীকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিহার ভাবনার অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন।

এই নীতিই ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয়ের মূল ভিত্তি। 'ব্রহ্মবিহার' বলতে শ্রেষ্ঠ, নির্দোষ, আদর্শ, মানবিক জীবন-যাপনকে বোঝায়। স্বীয় অন্তরে ও কর্মে অহিংসাবোধ বা মৈত্রী, দয়া, সাম্যভাব পোষণ, মনন ও লালন করাই হলো 'ব্রহ্মবিহার' ভাবনা। বৌদ্ধধর্ম দর্শনে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনাকে একত্রে ব্রহ্মবিহার দর্শন বা বিশুদ্ধির পথ হিসেবে অপ্রমেয় ভাবনা নামে অভিহিত করা হয়। উপর্যুক্ত কারণে বৌদ্ধ 'ব্রহ্মবিহার' অর্থ শ্রেষ্ঠ বা সাত্ত্বিকরূপে বসবাস করাকে বোঝায়। এই আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ব্রহ্মার-আচার-আচরণরূপে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বসবাস করাই হলো ব্রহ্মবিহার দর্শন। এ অনুভূতি প্রতিফলিত হবে আচরণীয় চারটি ধারায়।

১. মৈত্রী:

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের প্রথম স্তর হলো মৈত্রী। 'মৈত্রী' শব্দের মূল অর্থ হলো সত্যগণের প্রতি প্রেম, সৌহার্দ্য ও কল্যাণের ইচ্ছা। মৈত্রী এমন এক মনোভাব, যা অন্যের প্রতি হিতভাব পোষণ করে এবং শত্রুতাকে নির্মূল করে। সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের ইতিবুত্তকে মৈত্রীকে অতি ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। স্নেহ বা প্রীতি, সৌহার্দ্যে অনুরাগই মৈত্রীর নামান্তর। এর অর্থ হলো সকল সত্ত্বগণের প্রতি স্নেহ বা প্রীতিবহুল মৈত্রী ভাব পোষণ করা। মিত্র বা বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন কিংবা মিত্রত্বে সেরূপ প্রবর্তিত হওয়াকেই মৈত্রী নামে অভিহিত করা হয়। মৈত্রীতে লোভ, হিংসা বা দ্বেষ থাকে না, মোহ থাকে না নিঃস্বার্থতার পরিপ্রেক্ষিতে; শুধু অনাবিল প্রশান্তভাব তখন চিত্তের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে।

মৈত্রীর বিপরীত হলো দ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা। সমাজে এই শত্রুতার উদ্ভব ঘটে স্বার্থবিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব থেকে। যখন একজন ব্যক্তি অন্যের উন্নতি বা সাফল্যে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে, তখন হিংসা জন্ম নেয় এবং শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধ সেই চক্র ভাঙার উপায় হিসেবে মৈত্রীর অনুশীলন শিক্ষা দিয়েছেন। বুদ্ধ মৈত্রী ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে সূত্তনিপাতে বলেন-

> "মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তা মনুরকখে,
> এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।" (মহাস্থবির ও বড়ুয়া, ৪৭)

অর্থাৎ মাতা যেমন একমাত্র সন্তানকে জীবন দিয়ে ভালোবাসেন, রক্ষা করেন অনুরূপভাবে তোমরাও সেভাবে সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

এই উপমা মৈত্রীর গভীরতা বোঝায়। যেমন মায়ের ভালোবাসায় কোনো শর্ত থাকে না, তেমনি প্রকৃত মৈত্রীর মধ্যেও স্বার্থ বা প্রত্যাশা নেই। মৈত্রী এমন এক নৈতিক চেতনা, যা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে সার্বজনীন মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃত মৈত্রী কোনো ইন্দ্রিয়সুখ বা তৃষ্ণা-র অনুসারী নয়। কারণ তৃষ্ণা সবসময় ব্যক্তিগত লাভের সঙ্গে যুক্ত, অথচ মৈত্রী সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। মৈত্রী দ্বারা মানুষ অন্যের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করে। এতে মানুষ নিজের মনকে পরিশুদ্ধ করে এবং জীবনের সব স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মৈত্রী ধ্যান বৌদ্ধদের একটি প্রধান আধ্যাত্মিক অনুশীলন। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি চারদিকে মঙ্গল কামনা করেন- "সত্ত্বগণ সুখী হোন, নিরাপদ থাকুন, শান্ত থাকুন।" (করণীয় মেত্ত সুত্ত১.৮) এই অনুশীলনের ফলেই ক্রোধ, হিংসা ও আত্মকেন্দ্রিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

২. করুণা:

করুণা হলো বৌদ্ধ নৈতিকতার দ্বিতীয় স্তম্ভ। সর্ব প্রাণীর প্রতি দয়া, কৃপা, পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা, সহানুভূতি ইত্যাদি শব্দগুলো করুণার পরিপূরক। এরূপ চিত্ত এ করুণার সাথে সহজাত ও সংশ্লিষ্ট হয় বলে তাকে করুণাসহগত চিত্ত বলে অভিহিত করা হয়। করুণা প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ, বিশুদ্ধিমাগ্গ গ্রন্থে বলেন- "পরদুঃখ অপনয়ন কামতা", অর্থাৎ অন্যের দুঃখ দূর করার প্রবল ইচ্ছা (বুদ্ধঘোষ, বিশুদ্ধিমাগ্গ, অধ্যায় ৯)। যখন কেউ অন্যের দুঃখ দেখে নিজের হৃদয়ে তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, তখন করুণা জন্ম নেয়। এটি এক ধ্যানমূলক অবস্থা, যেখানে মানুষ অন্যের সুখের জন্য নিজের সুখও ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে।

করুণার অন্যতম দিক হলো হিংসা ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি। একজন করুণাশীল ব্যক্তি কখনো জীবহত্যা করে না, অন্যের দুঃখে আনন্দিত হয় না, বরং তার মুক্তির কামনা করে। যে ব্যক্তি করুণা চর্চা করে, সে ভয় ও দুঃখ উভয় থেকেই মুক্ত। এই করুণা কেবল মানবজাতির জন্য নয়, বরং সমস্ত জীবসত্তার জন্য। বুদ্ধের শিক্ষা সর্বজনীন জীবের দুঃখমোচনের উপর ভিত্তি করে। তাঁর দৃষ্টিতে করুণা মানে শুধু দয়া নয়; এটি এক গভীর জাগ্রত চেতনা, যা অন্যের কষ্ট নিজের মতো করে অনুভব করতে শেখায়। বৌদ্ধ নৈতিক দর্শনে আত্ম ও অপরের দুঃখের সমতা স্বীকার করে বলা হয়েছে- "যেহেতু সকলেই ভয় ও দুঃখকে অপ্রীতিকর মনে করে, তাই কেবল নিজের কল্যাণ নয়, অপরের কল্যাণ রক্ষাও নৈতিক কর্তব্য" (ধম্মপদ, শ্লোক ১২৯–১৩০)।

এই ভাবনা করুণার মূল ভিত্তি আত্মার সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীন চেতনার সঙ্গে একাত্মতা। করুণা হলো চেতনাভিত্তিক। হিংসা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে পরের দুঃখ-কষ্টকে আপনাররূপে গ্রহণ করাই হলো করুণা। করুণার দুটি দিক আছে। একটি অনুভূতি প্রবণতা বা আন্তরিকতাবোধ, অন্যটি হল দুর্গতের দুর্দশা মোচনে ব্যবস্থা করা। একটি চেতনাভিত্তিক করুণা মানুষের মানবীয় গুণাবলীর একটি অন্যতম উপাদান। এটা মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়ক। বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম উপাদান। করুণার কারণে মানুষ একে অন্যের আপদে-বিপদে এগিয়ে আসে। দুর্গত সর্বসত্ত্বের সাহায্যে এগিয়ে আসে, সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সর্বসত্ত্বকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। এরূপে মানুষের, সমাজের, বিশ্বের প্রতি দায়িত্ববোধের জায়গা তৈরী হয়। যা মানুষের আচরণে দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেয়। এ করুণা ভাবনা সাধককে সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা দেয়। এ ভাবনার দ্বারা আধ্যাত্মিকতা, মানবিকতা অর্জন করা সম্ভব হয়। এটাকে বুদ্ধের মানবিকতা, মানবতার শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

৩. মুদিতা:

মুদিতা হলো বৌদ্ধ নৈতিকতার তৃতীয় স্তম্ভ। 'মুদিতা' শব্দের অর্থ হলো অন্যের সুখ, সাফল্য ও সমৃদ্ধিতে আনন্দ অনুভব করা। এটি ঈর্ষা বা হিংসার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুদিতা তুষ্ট, হৃষ্ট, আনন্দিতভাব ও প্রফুল্লভাব প্রকাশ করে। পরের সুখ, সমৃদ্ধি সম্পদ, সৌভাগ্য, যশ, ঐশ্বর্য প্রভৃতিতে প্রসন্ন হওয়াই মুদিতা। ঈর্ষা, মাৎসর্যের ধ্বংস সাধন এর কৃত্য। সাধকের ঈর্ষা ও মাৎসর্যহীন মনেই উদার ও শুভ্র মনোবৃত্তির উদয় হয়। এর ঐকান্তিক অনুশীলনই মুদিতা ভাবনা। এর দ্বারা পরকে আপন করে নেওয়া যায়। মৈত্রী, করুণার সঙ্গে বোধিচিত্তে যে ইন্দ্রিয়াতীত অপরিসীম আনন্দ উৎপন্ন হয় তারই নাম মুদিতা।

মুদিতা অসন্তোষ ও ক্রোধ দূর করে হৃদয়কে প্রশান্ত করে। এটি আত্মার এক সূক্ষ্ম প্রশান্তি, যেখানে আনন্দ অনুরাগ বা স্বার্থ থেকে নয়, বরং নিঃস্বার্থ চেতনা থেকে উৎসারিত হয়। ধ্যানচর্চায় মুদিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। যখন ধ্যানকারী অন্যের সুখ, গুণ বা অর্জনের চিন্তা করেন এবং মনে প্রফুল্লতা আনেন, তখন তাঁর চিত্ত ঈর্ষামুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। এই মনোভাবই মুদিতা ধ্যানের সার। এই মুদিতা ভাবনা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ

বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বার্থান্ধতা দূরীভূত করতে সাহায্য করে। আত্মকেন্দ্রিকতা, ক্ষমতা প্রদর্শনে নিরুৎসাহিত করে। অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এই মুদিতা ভাবনা। মাৎসর্য নির্মূলে সাহায্য করে, ঈর্ষার বিলুপ্তি ঘটায়। অন্যের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করলে শান্তি বিঘ্নিত হয়। এ ভাবনা অন্যের স্বার্থে আঘাত করাকে, হিংসা করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। বরং অন্যের সুখ দেখে ঈর্ষাকাতর না হয়ে সমসুখী হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়। ফলে সর্বক্ষেত্রে শান্তি বিরাজ করে। এ ভাবনা উদার হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাবনা বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী মুদিতা সম্পর্কে বলেন- "অপরের সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্যকে আন্তরিকভাবে অনুমোদন ও আনন্দসহকারে গ্রহণ করাই হলো মুদিতা। যেমন- যুবক পুত্রের যৌবনাবস্থার স্থায়িত্ব কামনা করাকে মুদিতার প্রকৃষ্ট প্রকাশ বলা যায়।" ((মুৎসুদ্দী, ২৮৪)।

৪. উপেক্ষা:

ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয়ের শেষ স্তম্ভটি হলো উপেক্ষা। উপেক্ষার আক্ষরিক অর্থ 'সমদৃষ্টি' বা 'সমবেদনা'। এটি এমন এক মনোভাব, যেখানে মানুষ লাভ-অলাভ, যশ-অপযশ, নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি জীবনের পরিবর্তনশীল ঘটনাগুলিতে সমবস্থায় থাকতে শেখে। যে ব্যক্তি বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, সে প্রকৃত উপেক্ষাশীল। উপেক্ষা মানে উদাসীনতা নয়। এটি এক জ্ঞানমূলক স্থিতি, যেখানে আবেগের অস্থিরতা লুপ্ত হয়। উপেক্ষা মানুষকে শেখায় প্রত্যেক জীব তার কর্মফলের দ্বারা পরিচালিত। কেউ যদি মন্দ কাজ করে, সে দুঃখ ভোগ করবে; যদি সৎ কাজ করে, সে সুখ পাবে। তাই কোনো ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত বা বিদ্বেষ পোষণ করার প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে- 'লাভ ও অলাভ, যশ ও অপযশ, নিন্দা ও স্তুতি, সুখ ও দুঃখ এই অষ্টলোকধর্মকে সমভাবে সহ্য করাই উপেক্ষা'। (খুদ্দকপাঠো, মঙ্গল সুত্তং মূল পালি)। এটা হলো লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন। এটা মনের সাম্যাবস্থা। লোভ ও দ্বেষ উপেক্ষা দ্বারা ধ্বংস হয়। তিনি অষ্টলোক ধর্মে মনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখেন। সমাধি প্রবণ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অবলম্বন, অনুশীলন দ্বারা উপেক্ষা দর্শনে উন্নীত হয়। এর উৎপত্তি, প্রবৃদ্ধি এবং ভাবনায় পূর্ণতার জন্য বস্তু ও প্রাণীর প্রতি উপেক্ষাভাব পোষণ। নিম্নোক্ত চারটি বিষয় দ্বারা উপেক্ষাভাবের জাগরণ ত্বরান্বিত হতে পারে। (ভিক্ষু ও থের, ৫২)

- প্রাণীর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষাভাব, উন্নতি বিচার শক্তি ও অনুভূতির ভাব।
- বস্তুর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষা।
- নিজের বা স্বামীর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষা।
- দাম্ভিক বা স্বার্থপর ব্যক্তি বর্জন দ্বারা।

এই ধরনের ব্যক্তি নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী কাউকে প্রদান করতে আগ্রহী নয়। কেউ কিছু চাইলে সে দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে অথবা কার্পণ্যবশত প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে বিমুখ করে তোলে। এ ধরনের সঙ্গ পরিত্যাগ যোগ্য, কারণ এতে উপেক্ষা ভাবের ক্ষয় ঘটে। উপেক্ষা চিত্তের একাগ্রতা, অন্তর্লীনতা এবং উত্তেজনার সমতা রক্ষা করে সম্বোধি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। এটি আলম্বনের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব ও বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের প্রকাশকে নির্দেশ করে। এই অর্থে উপেক্ষা হলো জ্ঞানসম্পৃক্ত শোভন চিত্তের এক বিশেষ অবস্থা। এখানে উপেক্ষা বলতে তত্রমধ্যস্থতা বা সমবস্থানের ভাবকেও বোঝানো হয়েছে। এই সমবস্থায় অধিষ্ঠিত উপেক্ষাশীল ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব ও দোলাচল অতিক্রম করে শান্তিতে অবস্থান করেন। গীতায় যেমন বলা হয়েছে- "স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সুখে ও দুঃখে, লাভে ও ক্ষতিতে, জয়ে ও পরাজয়ে সমানভাবে অবিচল", (ভগবদ্গীতা- ২/৫৬)। এই শিক্ষার সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উপেক্ষার অনুশীলন মানুষকে জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর করে, অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে এবং মনকে মুক্ত ও স্বাধীন করে তোলে। ফলে উপেক্ষাশীল ব্যক্তির মধ্যে সহনশীলতা, নিরপেক্ষতা ও অন্তঃশান্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. ব্রহ্মবিহারের উপযোগিতা:

বুদ্ধের ধর্ম মূলত মানবকল্যাণমুখী। তিনি চতুরার্যসত্য ও মধ্যমার্গ প্রচার করে দুঃখ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সহমর্মিতা, দয়া, প্রেম ও সমদৃষ্টি। এই চারটি গুণ- মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা একত্রে ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় নামে পরিচিত। "ব্রহ্মবিহার" শব্দের অর্থ 'দিব্য' বা 'মহৎ আবাস'। অর্থাৎ এমন এক মানসিক অবস্থান যেখানে মন স্বার্থ, হিংসা, লোভ, বিরাগ প্রভৃতি অশুভ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকে।

এই চারটি গুণ একে অপরের পরিপূরক। মৈত্রী প্রেম শেখায়, করুণা সহানুভূতি শেখায়, মুদিতা আনন্দ শেখায় এবং উপেক্ষা সমবোধ শেখায়। যদি মৈত্রী দ্বারা বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, তবে করুণা সেই বন্ধুত্বে সহমর্মিতা যোগ করে; মুদিতা সেই সহমর্মিতাকে আনন্দে রূপান্তরিত করে; আর উপেক্ষা সেই আনন্দকে স্থায়িত্ব দেয়। বুদ্ধের মতে, এই চারটি মনোবৃত্তি বিকাশিত হলে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, মন নরম হয়, ক্রোধ ও হিংসা বিলুপ্ত হয়। মানুষ তখন নিজের ও অন্যের মধ্যে বিভাজন অনুভব করে না। এই চার গুণের মাধ্যমে মানুষ চতুর্ব্রহ্মবিহার স্থিতি অর্জন করে, যা নির্বাণের পথে একটি অপরিহার্য ধাপ। তাই বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সমানভাবে চর্চা করেন, সে জগতে ব্রহ্মলোকের অধিকারী হয়'। (দিঘ নিকায়- 'তেবিজ্জ সুত্ত'-১৩) নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মবিহারের উপযোগিতা অপরিসীম। সেগুলি হল-

ক. ব্যক্তিগত পর্যায়ে: এগুলি চিত্তশুদ্ধির সাধনায় সহায়ক। ক্রোধ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি বিকার দমন করে আত্মিক প্রশান্তি এনে দেয়।

খ. সামাজিক পর্যায়ে: মৈত্রী ও করুণা সামাজিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। মুদিতা অন্যের অগ্রগতিতে আনন্দিত হতে শেখায়, ফলে সমাজে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব হ্রাস পায়।

গ. আধ্যাত্মিক পর্যায়ে: উপেক্ষা চিত্তকে সমবস্থায় স্থিত রাখে, যা ধ্যান ও নির্বাণলাভের জন্য অপরিহার্য।

এই চারটি গুণ বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের মৌলিক ভিত্তি। নৈতিকতার উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিক আচরণ নয়, অন্তরের শুদ্ধি সাধন। ব্রহ্মবিহার সেই অন্তরের শুদ্ধিরই পথ। যিনি এই গুণগুলির অনুশীলন করেন, তাঁর মধ্যে আর ক্রোধ, হিংসা বা মোহের স্থান থাকে না।

অতএব বলা যায় ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় মানবধর্মের সর্বোচ্চ রূপ। এগুলি নৈতিকতা, করুণা ও সহমর্মিতার মেলবন্ধন, যা ব্যক্তি, সমাজ ও জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। বুদ্ধের দৃষ্টিতে সত্যিকার ধর্ম সেই, যা সকল জীবের কল্যাণে নিবেদিত। ব্রহ্মবিহার সেই ধর্মেরই নৈতিক প্রতিফলন।

৬. আধুনিক সমাজে ব্রহ্মবিহারের প্রাসঙ্গিকতা:

বৌদ্ধ ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো জীবের দুঃখ থেকে মুক্তি ও সর্বজনীন শান্তির প্রতিষ্ঠা। এই মুক্তি কেবল আধ্যাত্মিক নয়, নৈতিক ও সামাজিক শান্তিরও প্রতীক। বুদ্ধের প্রচারিত ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা মানবজীবনের নৈতিক ও মানসিক বিকাশের এমন এক আদর্শ ব্যবস্থা, যা আজকের আধুনিক সমাজেও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান যুগে প্রযুক্তিগত উন্নতি, বস্তুবাদী আকর্ষণ, প্রতিযোগিতা, হিংসা ও বিভাজনের মধ্যেও মানুষ ক্রমশ মানসিকভাবে ক্লান্ত ও অস্থির হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রহ্মবিহারের শিক্ষাগুলি মানবসমাজের নৈতিক পুনর্জাগরণের এক কার্যকর দিশা দেখাতে পারে।

মৈত্রীর প্রাসঙ্গিকতা আধুনিক সমাজে অপরিসীম। আজকের যুগে ব্যক্তি-মানুষ ক্রমে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়েছে, মানুষ মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখে। এই পরিস্থিতিতে মৈত্রী বা সর্বজনীন প্রেমের অনুশীলন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। মৈত্রী শেখায়

"সব সত্ত্বগণ সুখী হোন, নিরাপদ থাকুন", (করণীয় মেত্ত সুত্ত১.৮)। এই চেতনা যদি শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে গৃহীত হয়, তবে হিংসা ও বিভেদ হ্রাস পাবে, এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

করুণা আজকের সমাজে মানবিকতার পুনর্নির্মাণের এক প্রধান শক্তি হতে পারে। আধুনিক মানুষ স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা ও ভোগবাদের চাপে অন্যের দুঃখের প্রতি সংবেদনশীলতা হারাচ্ছে। করুণা মানুষকে শেখায় অন্যের দুঃখ নিজের মতো করে অনুভব করতে এবং তা দূর করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করতে। করুণা সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও সমতার ভিত্তি গড়ে তোলে। যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতারা করুণার নীতি অনুসরণ করেন, তবে সমাজে হিংসা, যুদ্ধ ও শোষণ অনেকাংশে কমে আসবে। করুণা কেবল আবেগ নয়; এটি এক কার্যকর নৈতিক প্রেরণা, যা সামাজিক পরিবর্তনের শক্তি সৃষ্টি করে।

মুদিতা আধুনিক সমাজে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার বিকল্প দর্শন। আজকের মানুষ প্রায়ই অন্যের সাফল্যে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে, ফলে জন্ম নেয় হিংসা ও অসন্তোষ। মুদিতা শেখায় অন্যের সুখ ও সাফল্যে আনন্দিত হতে, যা মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক ঐক্য আনে। যদি মানুষ মুদিতা অনুশীলন করে, তবে প্রতিযোগিতা সহযোগিতায় রূপান্তরিত হবে, এবং সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপেক্ষা আধুনিক জীবনের মানসিক ভারসাম্যের জন্য অপরিহার্য। আজ মানুষ লাভ-ক্ষতি, সাফল্য-ব্যর্থতা, প্রশংসা-নিন্দা, সুখ-দুঃখের দোলাচলে ক্রমাগত অস্থির। উপেক্ষা শেখায় এই দ্বৈততার মাঝেও সমবুদ্ধ ও স্থিতিশীল থাকা। এটি মানুষকে মানসিক দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়। আধুনিক জীবনের স্ট্রেস, উদ্বেগ ও বিষণ্নতা দূরীকরণে উপেক্ষা এক কার্যকর মানসিক চিকিৎসা হতে পারে।

ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় কেবল ব্যক্তিগত সাধনা নয়, এটি সামাজিক শান্তি ও মানবসম্পর্কের পুনর্গঠনের দর্শন। বর্তমান বিশ্বে ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও মতাদর্শের বিভাজন ক্রমশ বাড়ছে। এই বিভাজন দূর করতে ব্রহ্মবিহারের শিক্ষা প্রয়োজন যা মানুষকে শেখায় সব জীবের প্রতি সমান ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে।

উপসংহার:

ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের এমন এক চিরন্তন শিক্ষা, যা মানবজীবনের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারটি গুণ একসঙ্গে মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করে এবং সমাজকে শান্তি ও সৌহার্দ্যের পথে পরিচালিত করে। বুদ্ধের দর্শনে ধর্ম কেবল কোনো আচার বা উপাসনা নয়; এটি এক জীবন্ত নৈতিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি অর্জন করে এবং অপরের মঙ্গলসাধনে নিবেদিত হয়। এই চারটি ব্রহ্মবিহার মানুষের মধ্যে অহংকার, লোভ, হিংসা ও বিদ্বেষের প্রবণতা দূর করে। ফলে ব্যক্তি নিজেকে অশুভ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করে চিত্তশান্তি ও আত্মোন্নতির পথে এগিয়ে যায়। ব্রহ্মবিহারের শিক্ষা ব্যক্তি-মানুষকে শেখায় অন্যের সুখে সুখী হতে, অন্যের দুঃখে দুঃখিত হতে এবং জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যেও সমবুদ্ধ থাকতে। এই চারটি গুণ এমনভাবে পরস্পর পরিপূরক যে, এগুলি একত্রে মানবধর্মের পরিপূর্ণ রূপ প্রদান করে। ব্রহ্মবিহারের চর্চা মানেই নিজের ভেতরের শুভবোধকে বিকশিত করা যা বুদ্ধের নির্বাণধর্মী জীবনদর্শনের কেন্দ্রে অবস্থান করে।

আধুনিক বিশ্বে, যেখানে মানুষ বস্তুগত উন্নতির মোহে আত্মিক শান্তি হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় এক নতুন মানবিকতার দিশা দেখায়। প্রযুক্তি, প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার মোহ মানুষকে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক ও নির্দয় করে তুলেছে। ফলে সমাজে বেড়েছে হিংসা, অসহিষ্ণুতা ও মানসিক অস্থিরতা। এই পরিস্থিতিতে ব্রহ্মবিহারের শিক্ষা একপ্রকার নৈতিক পুনর্জাগরণের আহ্বান। মৈত্রী শেখায় প্রেম ও সৌহার্দ্য, করুণা শেখায় সহানুভূতি ও দুঃখমোচনের ইচ্ছা, মুদিতা শেখায় অন্যের আনন্দে অংশীদার হওয়া, আর উপেক্ষা

শেখায় মানসিক স্থিতি ও সমবেদনা। যদি এই গুণগুলি আধুনিক জীবনের অংশ হয়ে ওঠে, তবে সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠা পাবে সহাবস্থান, মানবতা ও শান্তি। রাষ্ট্র, ধর্ম, অর্থনীতি ও শিক্ষা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্রহ্মবিহারের নীতি প্রয়োগ করা গেলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও নৈতিক ঐক্য বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং বলা যায়, ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় কেবল প্রাচীন ধর্মীয় আদর্শ নয়, এটি এক বিশ্বজনীন নৈতিক দর্শন যা অতীতের মতো আজও প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যত মানবসভ্যতার নৈতিক ভিত্তি স্থাপনে অপরিহার্য।

এইভাবে ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় বৌদ্ধ নৈতিক দর্শনের আলোকে এর তাৎপর্য ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আলোচনা করে দেখালাম।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চৌধুরী, সুকোমল। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৭।
২. দত্ত, নারায়ণ। বুদ্ধের জীবন ও বাণী। বিশ্বভারতী প্রকাশন, শান্তিনিকেতন, ২০০৪।
৩. দত্ত, মণীন্দ্রনাথ। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব ও মানবধর্ম। আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫।
৪. পূর্ণানন্দ, শ্রমণ অনূদিত, বিশুদ্ধিমার্গ। কলকাতা, ১৯৩৬।
৫. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৯।
৬. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় নীতিবিদ্যা। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৮।
৭. ব্রহ্মচারী, শ্রীশীলানন্দ, বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা। জেতবন বিহার পরিষদ, বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনা ট্রাস্ট, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।
৮. বুদ্ধঘোষ, বিশুদ্ধিমাগ্গ। নবম অধ্যায় (ব্রহ্মবিহার), ভিক্ষু ঞাণমোলি অনূদিত, বৌদ্ধ পাবলিকেশন সোসাইটি।
৯. ভট্টাচার্য, বিনয়কুমার। বৌদ্ধ দর্শন ও নৈতিকতা। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা, ২০০৮।
১০. ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি। বৌদ্ধ চিন্তা ও আধুনিক সমাজ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১।
১১. ভিক্ষু, শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ অনূদিত ও থের, শ্রীমৎ তিলোকাবংশ সম্পাদিত, অভিধর্ম পিটকে সঙ্গায়ন-প্রশ্ন। প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী, চট্টগ্রাম, ৩০শে মে, ২০১১।
১২. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮।
১৩. মহাস্থবির, শান্তরক্ষিত, বৌদ্ধ সাধনা নীতি। চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫ শে জুলাই ২০১০।
১৪. মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার অনূদিত। ধর্মপদ। কলকাতা, ১৯৫৪।
১৫. মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত। বৌদ্ধ তত্ত্বচিন্তা। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯।
১৬. মুৎসুদ্দী, শ্রীবীরেন্দ্রলাল অনূদিত ও সম্পাদিত, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম। চট্টগ্রাম, ১৮ জুলাই ১৯৪০।
১৭. সামন্ত, বিমলেন্দু। নীতিতত্ত্ব। স্মার্ট বুকস্, কলকাতা, ২০২১।
১৮. Bodhi, Bhikkhu, translator. The Suttanipāta. Wisdom Publications, 2017. Karaṇīya Mettā Sutta (1.8).
১৯. Buddhaghosa. (2010). Visuddhimagga (The Path of Purification) (Bhikkhu Ñāṇamoli, Trans.). Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society. (Chapter IX: Brahmavihāra—Karuṇā).
২০. Gethin, Rupert. The Foundations of Buddhism. Oxford University Press, 1998.
২১. Harvey, Peter. An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices. Cambridge University Press, 2013.
২২. Hiriyanna, M., Outlines of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, 2000.

২৩. Keown, Damien. Buddhism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2000.
২৪. Rahula, Walpola. What the Buddha Taught, Grove Press, 1974.
২৫. Sharma, Chandradhar, A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, 1960.
২৬. Sinha, Jadunath, Indian Philosophy, Vol-II, Motilal Benarsidass, Delhi, 2006.